SUNDARBANER ITIHAS

History of Sundarban by A.F.M. Abdul Jalil

HISTORY : LOCAL-BENGAL

প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০

হরফবিন্যাস
অ্যালায়েড প্রিন্ট সিস্টেমস
১৯৭-বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রণ
নিউ সারদা প্রেস
৯ সি শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

পার্থশঙ্কর বসু কর্তৃক নয়া উদ্যোগ,
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত।

ছয়

সুন্দরবনের জীবজন্তু ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা

সুন্দরবনের সর্বত্র স্থল ও জলভাগে অসংখ্য জীবজন্তু বাস করে। নিবিড় অরণ্যানী ও বিশালাকায় নদনদী, "ডান্ধায় বাঘ---জলে কুমীর" প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর জন্য সুন্দরবনকে ভীষণতায় পরিণত করিয়াছে। এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিলে অনেকের মনে সুন্দরবন সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হয় এবং উহার রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক কাহিনী শুনিতে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য জন্মে।

ব্যাঘ্র : সুন্দববনের জীবজন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্রের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশেব ব্যাঘ্র অপেক্ষা সুন্দরবনের ব্যাঘ্র অত্যধিক বলশালী ও হিংস্র। এই ধরণেব ভীমমূর্তিধারী ব্যাঘ্র বিশ্বের আর কোথাও নাই। তন্নিমিত্ত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ইহাকে রয়াল বেন্দ্বল টাইগার (Royal Bengal Tiger) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাঘ্রেব প্রতাপ এত অধিক যে উহার ভয়ে সুন্দরবনের অন্যান্য সমস্ত প্রাণী এবং মানুষ সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। জন্দ্বলের লোকেরা ইহাকে বড় শিযাল ও বড় মিয়া বলিয়া থাকে। হিন্দুরা ব্যাঘ্রকে বড় মামা, বড দাদা এবং কেহ গাজী ঠাকুরও বলে। ব্যাঘ্রের কথা শ্রবণে অনেক অন্ত্যজ হিন্দু শক্তিশালী এই জন্তুর প্রতি ভীতিপূর্ণ নমস্কার জানায়। আবার কেহ কেহ বিবক্তির সহিত ইহাকে ভোতড়ও বলে। বাওয়ালীরা উহার ভয়ে অনেক সময় বাঘ বা ব্যাঘ্র নাম উচ্চারণ করে না।

সুন্দববনের ব্যাঘ্রের গাত্র হরিদ্রা বর্ণের এবং কাল ডোরাযুক্ত। কোন কোন ব্যাঘ্রের গায়ে লম্বা কাল ডোরা বা গোলাকার চিহ্ন দেখা যায়। গোলাকার ফোটাযুক্ত বাঘকে গুলবাঘ বলা হয়। এগুলি সুন্দরবনে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ৮ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রায় চারি ফুট উঁচু হয়। ইহাদের সম্মুখের পদ দ্বয় মোটা ও অতিমাত্রায় বলশালী। বড় বড ব্যাঘ্রে মহিষ, গরু প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু সহজে স্কন্ধের উপর ফেলিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। বাঘের মস্তক বৃহৎ ও গোলাকৃতি এবং চক্ষু দ্বয় বেশ বড় ও অত্যুজ্জ্বল। এহেন ভয়ংকর ও সুতীব্র চাহনী পৃথিবীর অন্য কোন জন্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

বিড়ালেব আকৃতি ব্যাঘ্রের ন্যায়, সেজন্য এদেশে বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলা হইযা থাকে। কিন্তু বিড়ালের প্রকৃতি শান্ত এবং ব্যাঘ্রের প্রকৃতি হিংস্র। রয়াল বেন্দ্বল টাইগার অতিমাত্রায় রক্তপিপাসু, হিংস্র এবং শিকারের সময় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। জীবজন্তু শিকারের পর ব্যাঘ্র প্রথমে উহার স্কন্ধ হইতে রক্তপান করে। সাধারণতঃ ইহারা পিছন দিক হইতে আসিয়া মানুষের স্কন্ধে কামড় দেয়। ব্যাঘ্রের মধ্যে কোনকোনটি

নরখাদক। যে-সমস্ত ব্যাঘ্র একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পাইয়াছে তাহারা যে কোন অবস্থায় মানুষ আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। মানুষ দেখা মাত্র উগ্র নেশা চড়িয়া যায় এবং ইহারাই মনুষ্য শিকারে দক্ষ। তজ্জন্য লোকে এই প্রকার ব্যাঘ্রকে নরখাদক বলে। সাধারণ ব্যাঘ্র অপেক্ষা নরখাদক অত্যধিক ভয়ঙ্কর ও হিংস্র এবং ইহাদের ভয়ে ঝানু শিকারী পর্যন্ত শিহরিয়া উঠে। ইহাদের সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুন্দরবনের হ'দো, হেন্তাল ও বলাসুন্দরী বৃক্ষের নীচে লুক্কায়িত থাকিয়া ব্যাঘ্রে শিকার করিয়া থাকে। শিকারের সুযোগ পাইবামাত্র সে ভীম বিক্রমে উহার উপর লাফাইয়া পড়ে।

বাঘিনী ২ হইতে ৫টি পর্যন্ত ছানা প্রসব করে এবং প্রসবের পর ছানাগুলিকে লুকাইয়া রাখে। ব্যাঘ্রে দেখিতে পাইলে ছানাগুলি খাইয়া ফেলে। বাঘিনী কিছুতেই তাহার বাচ্চা অন্যকে খাইতে দেয় না। বাচ্চা প্রসবের পর উহার পেট খালি হয় এবং অন্য কোন খাদ্য না পাইলে স্বীয় বাচ্চা কদাচিত ভক্ষণ করে। ইহা এই সময়কার বিশেষ ব্যতিক্রম। এই সময় বাঘিনী বাচ্চাকে জিহ্বা দিয়া চাটিতে বিশেষ আস্বাদ পায় এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাচ্চা ভক্ষণ করে। ব্যাঘ্রের তেজব্যঞ্জক ও ভয়াবহ মূর্তির জন্য উহাকে সাধারণে সুন্দরবনের রাজা বলিয়া থাকে। সুন্দরবনে সচরাচর ব্যাঘ্রের ডাক শ্রুত হয় না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় বাঘ ও বাঘিনীর ডাক শুনা যায়।

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রের প্রয়োজনিয়তা অত্যধিক। ব্যাঘ্রের অবস্থানের জন্য চোর ডাকাতেরা সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করিতে ভয় পায়। ব্যাঘ্র না থাকিলে মানুষ এতদিনে হরিণের বংশ ধ্বংস করিয়া দিত। ব্যাঘ্রের আক্রমণ ভয়ে কেহ জন্দ্বলের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া শিকার করিতে সাহস পায় না। সেজন্য বনবিভাগও ব্যাঘ্রকুলকে ধ্বংস করিতে দেয় না। ব্যাঘ্র, সর্প, বন্যবরাহ প্রভৃতি ধ্বংস হইলে সুন্দরবনের সম্পদ রক্ষিত হইবে না। এই সমস্ত জন্তুরও আবশ্যকতা আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সুন্দরবনে উহাদের অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে ব্যাঘ্রকুল ধ্বংস করা বহুলাংশে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্রকে শুধু ভক্ষক বলিলে ভুল হইবে, উহা সুন্দরবনের রক্ষকও বটে। গবাদি পশুর কোন একটি বিশেষ অসুখ হইলে সুন্দরবনের লোকেরা ব্যাঘ্রের দন্ত বা উহার মস্তকের হাড় ঘসিয়া কলাপাতার মোড়কে পুরিয়া খাওয়াইয়া দেয়। উহাতে অসুখ আরাম হয় বলিয়া শুনা যায়। ব্যাঘ্রে বানর, শূকর ও হরিণ ধরিয়া খাইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য ও কাঁকড়া খায়। সুন্দরবনে পূর্বে চিতাবাঘ ছিল, এখন উহার বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যাঘ্রের চামড়া বহু প্রয়োজনে লাগে। উহার দ্বারা জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের পশম, গোঁফ, কেশর, দাঁত ও হাড় দ্বারা অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহার মাংস ও জিহ্বায় মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। ব্যাঘ্র জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষের উপকারে আসে। পুরাকালে গ্রীসদেশের

লোকে ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাঘ্র নখের অলঙ্কার ব্যবহার করিত। ইহা মানব জাতির মহাশত্রু এবং মহোপকারীও বটে। মগ জাতীয় লোকেরা ব্যাঘ্রের মাংস খাইয়া থাকে। নীলকমল, ভেদাখালী ও কটকা, ঝাপা, মরাধুলি, ছাপড়াখালী, ত্রিকোণ-দ্বীপ, কাঠেশ্বর, ডিন্দ্বিমারী, বৈকীরি, চুনকুড়ি, পুষ্পকাটী প্রভৃতি জন্দ্বলে ব্যাঘ্রের আধিক্য দেখা যায়। সুন্দরবনের নরখাদক বা মানুষখেঁকো বাঘ (Man eaters of Sundarbans) ও ব্যাঘ্র শিকার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

হরিণ : হরিণ সুন্দরবনের এক মনোরম ও প্রিয়দর্শন জন্তু এবং মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। বনানীর সর্বত্রই ইহারা বসবাস করে। সুন্দরবনে হরিণের গমনাগমনের পথ আছে, এবং এই জন্তু চলিবার সময় পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। হরিণ দলে দলে চলিয়া আহার সংগ্রহ করে। ইহারা খুব আরামপ্রিয়। এই শৌখিন জন্তু কর্দমাক্ত স্থান মোটেই পছন্দ করেনা। তবে বাধ্য হইয়া উহাদের এই কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পায়ে কাদা লাগিলে উহারা বিরক্তি বোধ করে এবং ঝাড়া দিয়া কাদা ফেলিতে থাকে। পৃথিবীতে ইহার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট জন্তু আর আছে কিনা সন্দেহ। সুযোগ পাইলেই ব্যাঘ্রে হরিণ ধরিয়া খায়। কিন্তু ব্যাঘ্রের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র হরিণ তীর বেগে দৌড় দেয় এবং প্রতিযোগিতায় ব্যাঘ্র হরিণের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। অতিমাত্রায় হুশিয়ার এই জন্তু। ব্যাঘ্র দর্শনে হরিণ কুঁ কুঁ শব্দ করে। উহারা খুব চঞ্চল এবং সর্বদা সতর্কতার সহিত চলাফেরা করে। বাদা অঞ্চলের লোকেরা বলে, ব্যাঘ্র কুড়ি হাত আর হরিণ একুশ হাত পর্যন্ত এক লম্ফ দিয়া যাইতে পারে। এইজন্যই সম্ভবতঃ হরিণকে সহসা ব্যাঘ্রে ধরিতে পারেনা। শিন্দ্বেল হরিণ দ্রুত দৌড়াইবার সময় বৃক্ষলতার সন্দ্বে যাহাতে শিঙ জড়াইয়া না যায় সেইজন্য মাথা ও শিঙ উপর পিঠের উপর ফেলিয়া রাখে। হরিণের পদগুলি সরু ও দীর্ঘ। তজ্জন্য উহারা দ্রুত দৌড়াইতে পারে। হরিণের চক্ষু অতীব সুন্দর এবং রং রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ। ইহাদের গাত্রে সাদা সাদা ডোরা। সুন্দরবনে এই ধরনের ডোরাযুক্ত হরিণই অত্যধিক। কিছু কিছু কুকুরে হরিণও সুন্দরবনে আছে।

এগুলির রং খেঁকশিয়ালের বর্ণের ন্যায় এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। কাল ও সাদা হরিণ কদাচিৎ সুন্দরবনে দৃষ্ট হয়। সাদা হরিণের গায়ে কাল ডোরা দেখা যায়। শরণখোলা রেঞ্জের কোন ঝোপজন্দ্বলের হরিণ খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং ঈষৎ কাল বর্ণের।

হরিণের মাংস সর্বজাতীয় লোকে খায়। এদেশের লোকেরা হরিণের মাংস পাইলে খুব আদর করিয়া ভক্ষণ করে। তবে উহা খাসী ছাগলের ন্যায় সুস্বাদু নহে। মাংসের বর্ণ গাঢ় লাল এবং চর্বি খুব কম। একটি হরিণে একমণ মাংস হইয়া থাকে। মৃগ শিকার পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশে সুপরিচিত। পুরাকালে বিভিন্ন দেশের রাজা-মহারাজারা পাত্রমিত্রসহ মৃগ শিকারে যাইতেন। সে কথা বিভিন্ন জাতির গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

হরিণ সুন্দরবনের বৃক্ষের পাতা ও ফল খায়। ওড়া, কেওড়া, গোল, ধোন্দল, গেউয়া প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হরিণেরা যত্নের সহিত ভক্ষণ করে। এই সমস্ত ফল জোয়ারের জলে দূরে নীত হয় এবং জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া থাকে। দলে দলে হরিণ আসিয়া উহা ভক্ষণ করে। কেওড়ার পাতা ও ফল হরিণের সুখাদ্য। বানরেরা হরিণের জন্য ডাল ভাঙ্গিয়া ফল ও পাতা খাইবার নিমিত্ত নিম্নে ফেলিয়া দেয়। বানরের সঙ্গে হরিণের সখ্যতা অত্যধিক। ব্যাঘ্র দেখিলে উহারা একপ্রকার বিশিষ্ট ধরনের শব্দ করে এবং এইরূপ বিপদসংকেত পাইবামাত্র হরিণেরা তথা হইতে পলায়ন করে। সুন্দরবনের নিকটবর্তী লোকালয়ে আসিয়া সময় সময় হরিণে ক্ষেত হইতে ধান্য খাইয়া যায়। কৃষকেরা তাড়া করিলে ইহারা ক্ষিপ্র গতিতে জঙ্গলাভ্যন্তরে পলায়ন করে। সুযোগমত আবার হরিণের বাচ্চা তাহাদের হাতে ধরা পড়ে।

ধনাঢ্য লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া হরিণের বাচ্চা পুষিয়া থাকে। কিন্তু শিঙ উঠিলে উহা শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া ঘায়েল করে। বড় শিঙওয়ালা হরিণকে শিঙেল বলে। সুন্দরবনে হরিণ শিকার সহজ এবং দুরূহ বটে। হরিণ এত সজাগ যে গুলি করারও সুযোগ দেয় না। মানুষের গন্ধ পাইলে হরিণ তীর বেগে ছুটিতে থাকে। শিকারীর গা ঘেঁসিয়া বাতাস প্রবাহিত হইলে হরিণে বুঝিতে পারে। সেইজন্য শিকারীকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। দূরে শিকারী ধূমপান করিলেও উহা হরিণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। সেইজন্য শিকারীরা শিকারের সময় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া ধূমপান করিতে পারে না। ব্যাঘ্র অপেক্ষা হরিণের ঘ্রাণশক্তি অধিকতর প্রখর। মানুষের বুদ্ধি কৌশলের নিকট এহেন হুঁশিয়ার প্রাণীদেরও মতিভ্রম ঘটে।

হরিণের শিঙ এক ফুটের অধিক লম্বা হয় এবং উহার শাখা প্রশাখা হইয়া থাকে। ইহাই হরিণ-শিঙের বৈশিষ্ট্য। যে হরিণের শিঙ চামড়া বেষ্টিত, উহাকে "ভেলভেট" বলে। স্ত্রী হরিণের শিঙ গজায় না। কেবলমাত্র পুরুষ হরিণের শিঙ হয়। শিঙ-এর তারতম্য অনুসারে উহাকে কাঠ শিঙেল, কাল শিঙেল, বুটো শিঙেল ও খোর শিঙেল বলা হইয়া থাকে। শিকারীরা সাধারণতঃ স্ত্রী ও গর্ভবতী হরিণকে শিকার করে না। কর্তৃপক্ষ সুন্দরবন হইতে বিশেষ অনুমতি ভিন্ন হরিণ শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়াছে। হরিণের নিরাপত্তার জন্য সুন্দরবনে কয়েকটি ঘের পৃথকভাবে রাখা হইয়াছে। উহাকে পশুপক্ষীর নিরাপদ আবাসভূমি (Sanctuary) বলা হয়। ঝাপা, নীলকমল, বায়লাকয়লা, দুবলার ট্যাক, বিবির মাদে, আমবাড়ীয়া প্রভৃতি জঙ্গলে প্রচুর হরিণ পাওয়া যায়।

শুধু মাংস নহে, হরিণের চামড়ার দ্বারাও মানুষের উপকার হয়। এই জন্তুর চামড়ায় সুন্দর জুতা প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত লোকে উহা জায়নামাজ রূপেও ব্যবহার করে। হিন্দুরা হরিণের চামড়া বিছাইয়া পূজার আসন করিয়া থাকে। হরিণের শিঙ দ্বারা সুন্দর ছড়ি

প্রস্তুত হয়। হরিণ পৃথিবীর মধ্যে একটি সুন্দর জন্তু এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের বিশেষ প্রিয়। মানুষ ইহাকে অত্যন্ত আদর করে। কবি এই সৌন্দর্যশালী জন্তুর মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"বনের হরিণ বলে আমি কার বা ধার ধারি,
আপনার মাংস দিয়া জগৎ কর্‌লাম রৈবী।"

বানর ও বন্যবরাহ : সুন্দরবনের জন্তুর মধ্যে বানর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। বানরের আকৃতি ও প্রকৃতি সকলের জানা আছে। সুন্দরবনের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে বানর অবস্থান করে। ইহারা হরিণের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গর্বানুভব করে। ব্যাঘ্র দর্শনে বানরে কঁ্যা কঁ্যা শব্দ করে। আবার কোন কোন সময় সাধুর ন্যায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে। এই ধূর্ত জন্তু গাত্রে কাদা মাখিয়া মৌচাক হইতে মধু পান করে। কাদার জন্য উহার গাত্রে মৌমাছির হুল বিঁধিতে পারে না।

বানরে হরিণকে বৃক্ষের ডাল ভান্দিয়া পাতা ও ফল খাইতে দেয়। বানরেরা কোন কোন সময় হরিণের পিঠে চড়িয়া বেড়ায় এবং আনন্দ উপভোগ করে। শিকারের সময় ক্রোধান্বিত বানর মানুষের হাত কামড়াইয়া দেয়। বানর বনবিভাগের অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীব। ব্যাঘ্র দর্শনে ইহারা শুধু হরিণকে বিপদ সংকেত দিয়া সরাইয়া দেয় না, মানুষকেও বিশেষ সাবধান করিয়া দেয়। দূরে ব্যাঘ্র দেখিলে বানরেরা ধপাস্ করিয়া বৃক্ষের ডাল হইতে মাটিতে পড়ে এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করে। কাঠুরিয়া ও শিকারীরা "বিপদ সংকেত" বুঝিতে পারিয়া সাবধানতা অবলম্বন করে। হরিণ ব্যাঘ্রাক্রমণের বিপদ সংকেত বুঝিতে না পারিলে বানর উহার মুখে চপেটাঘাত করে।

বন্য বরাহ বা বুনো শূকর সুন্দরবনের সর্বত্র বাস করে। ইহাদিগকে সুযোগ পাইলে বাঘে ধরিয়া খায়। বন্য বরাহের শক্তি খুব বেশী এবং অনেক সময় ইহাদিগকে শিকার করিতে বাঘের গলদঘর্ম হইয়া যায়। শূকরগুলি প্রায় তিনহাত লম্বা এবং একহাত আন্দাজ উঁচু হয়। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ ; ঘাড়, বুক ও পেটের লোম গোড়ার দিকে কাল এবং অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণের। সুন্দরবনের শূকরের মস্তক প্রকান্ড ও দাঁত খুব বড ও প্রখর হয়। এজন্য লোকে শূকরকে দাঁতাল বলে।

অন্যান্য জন্তু--গণ্ডার ও বয়ার : সুন্দরবনের অন্যান্য জন্তুর মধ্যে "উদ্" বা ধাঁড়ে, সজারু, বনবিড়াল প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। সজারুর গায়ে লম্বা কাটা থাকে। উদ বা ধাঁড়ে পোষ মানিলে উহারা জেলেদের মৎস্য ধরায় বিশেষ সাহায্য করে। সুন্দরবনে শৃগাল নাই। সম্ভবতঃ কর্দমাক্ত স্থান শৃগালের পক্ষে বাসের অনুপযোগী। ব্যাঘ্রের দাপটেও শৃগালকুল সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জঙ্গলের বাইসন বা বন্য গরুও সুন্দরবনে নাই।

সুন্দরবনে কোথাও গণ্ডার নাই বলিয়া সকলেই জানে কিন্তু কেহ কেহ বলেন এখনও গভীর জন্দ্বলের মধ্যে কোথাও গণ্ডার থাকিতে পারে। তবে একথা সত্য যে সুন্দরবনে পূর্বে বহু গণ্ডার ছিল এবং কি কারণে এখন গণ্ডার দৃষ্ট হয়না তাহা অনেকেই বলিতে পারে না। সুন্দরবন অঞ্চলে শ্যামনগর থানার অর্ন্তগত হরিনগর গ্রামে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পুকুর খননের সময় এফাজতুল্লা সরদারের বাড়ীতে একটি বড় গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। উহা এখনও সেই বাড়ীতে রক্ষিত আছে। উক্ত থানার শ্রীফলকাঠি গ্রামে গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ধুমঘাটে দীঘি খননের সময় ছয়টি গণ্ডারের কঙ্কাল পওয়া গিয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ লোকরা শ্রীফলাকাঠি ও খেগড়াঘাটের জন্দ্বলে স্বচক্ষে গণ্ডার দেখিয়াছেন। গণ্ডারের শিঙ অতীব মূল্যাবান। সাধারণতঃ ইহারা তৃণভোজী। ঈশ্বরীপুরে মাখনলাল অধিকারীর বাড়ীতে ৬টি গণ্ডারের কঙ্কাল দেখিয়াছি।

সুন্দরবনে মহিষ, গরু ও হস্তী নাই। তবে বাগেরহাট অঞ্চলের সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে বন্য মহিষ পাওয়া যাইত। মানসিংহ কর্তৃক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে পাঠান বিদ্রোহ দমনের পর তাঁহাকে সুন্দরবন অঞ্চলে ফতেহাবাদ সরকারের জায়গীর প্রদত্ত হয়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এই অঞ্চলে তখন বহু হস্তী ও অন্যান্য বন্য জন্তু পাওয়া যাইত। সজারু এবং চিতাবাঘও সুন্দরবনে পাওয়া যাইত। বনাঞ্চলের লোকেরা পূর্বে গণ্ডার ও মহিষ শিকার করিত এবং উহার মাংস ভক্ষণ করিত। লোক বুনো মহিষকে বয়ার বলিত এবং গ্রামের মেয়েরা হরিণ শিকারের ন্যায় বয়ার ও গন্ডার শিকারের গল্প করিত। গণ্ডারকে "গাড়া" বলা হইত। রামপাল থানার "গাড়া মারা" নামে একটি গ্রাম আছে।

গণ্ডার হরিণের ন্যায় অনেকগুলি বাচ্চা প্রসব করে না। কথিত আছে যে গণ্ডার দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে মাত্র একটি বাচ্চা প্রসব করে। গণ্ডারের প্রাচুর্যের জন্য সম্ভবতঃ নদীর নাম হইয়াছে গাড়া নদী। বিভারীজ সাহেব বাকেরগঞ্জের দক্ষিণে কুক্‌রী মুক্‌রী দ্বীপে শূকর ও বন্য মহিষ দেখিয়াছেন। তখন সেখানে হরিণ ছিল না। গণ্ডার সম্পর্কে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন বলেন যে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক গণ্ডার সুন্দরবনে ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে গণ্ডার সাংঘাতিক হিংস্র জন্তু। ইহা অন্য জন্তুর মাংসসহ চামড়াও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালঞ্চ ও রায়মন্দ্বল নদীর মোহনার সন্নিকটে অসংখ্য গণ্ডার ছিল। দেশী শিকারীদের হাতে পড়িয়া গণ্ডার ও বন্য মহিষের বংশ ধ্বংস হইয়াছে। গ্যান্ডারখালীব জন্দ্বল একটি বাঘের আড্ডা এবং ভয়সঙ্কুল স্থান। কেহ কেহ বলেন, এখানে এককালে বহু গণ্ডার পাওয়া যাইত। সেইজন্য জন্দ্বলের নাম হইয়াছে গণ্ডারখালী বা গ্যাণ্ডারখালী।

গণ্ডারের শিঙ মূল্যবান পদার্থ। পুরাকালে ইজিপ্টের রাজারা বিষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গণ্ডারের শিঙ দ্বারা পান করিতেন।

সুন্দরবনের সর্প ও তারকেল : সুন্দরবনের সর্প ভয়ঙ্কর জীব। যেমন বাঘের ভয়, সর্পের ভয় প্রায় সেইরূপ। তবে জন্দ্বলের মধ্যে সর্পাপেক্ষা ব্যাঘ্র আগেই দেখা যায় এবং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। সর্প অতর্কিতে মানুষকে আক্রমণ করে। তবে সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণের ন্যায় সাপের ভয় ততোধিক নহে। সুন্দরবনে যত্রতত্র সর্প আছে। বন্দুক দ্বারা অনেক সময় সর্প মারা যায় না। ইহারা কোন কোন সময় লেজ দ্বারা বৃক্ষের ডাল জড়াইয়া অধোমুখে ঝুলিয়া থাকে এবং কোন জন্তু গেলে উহাকে সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। সুন্দরবনে বহুল পরিমাণে বিষাক্ত সর্প আছে। বড় বড় সর্পের শক্তি অসীম। উহারা বড় বড় জন্তু পেচাইয়া উপড়াইয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। ব্যাঘ্র পর্যন্ত সর্পকে বিশেষ ভয় করে। সর্প দংশনে ব্যাঘ্রও নিহত হয় বলিয়া শুনা যায়।

সর্প সাধারণতঃ দুই প্রকার—বিষহীন ও বিষাক্ত। বিষধর সর্পকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—চৌপাশা, বোড়া এবং বীজজড়ী। কেউটা, গোখুবা, আইরাজ ও কানড় ; এই চারি প্রকার সর্পই চৌপাশা শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের আবার প্রকারভেদ আছে। কেউটা, আবার কাল কেউটা, পদ্ম কেউটা, বাঁশবুনে কেউটা প্রভৃতি। গোখুরা ৫ প্রকার—কালী গোখুরা, পদ্ম গোখুরা, খ'য়ে গোখুরা, হলদে গোখুরা ও নাগরাজ গোখুরা। আইরাজ অনেক প্রকার—তন্মধ্যে দুধরাজ, পাতরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচুর প্রসিদ্ধ। শঙ্খরাজ সর্পের বিষ সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। কানড়েরও এইরূপ শ্রেণী বিভাগ আছে।

কেউটা সাপের মস্তকে পদ্ম বা গোলাকাব চিহ্ন আছে এবং গোখুরার মস্তকে "U" চিহ্ন আছে। কেউটা, গোখুরা ও আইরাজের ফণা আছে। কিন্তু কানড়ের ফণা হয় না। প্রত্যেকটি সর্পে সাংঘাতিক বিষ আছে। ইহাদের আঘাতে মানুষ অধিক সময় বাঁচিতে পারে না। বহু গবেষণার পরও আজ পর্যন্ত সর্পাঘাতের কোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্রাম্য ওঝারা নানা প্রকার মন্ত্র, দোয়া, তাবিজ ও বৃক্ষের শিকড় বা লতা দ্বারা কোন কোন সময় সর্পাঘাতের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তবে উহা নির্ভরযোগ্য নহে। আমাদের দেশের লোকালয়ে কেউটা ও গোখুরা সাপ দৃষ্ট হয়। আইরাজ সর্প সুন্দরবনেই অধিক। গ্রামাঞ্চলের সর্পকুল হইতে সুন্দরবনের সর্পের প্রকৃতি একটু পৃথক। আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য বন্য সর্প কম বিষাক্ত।

কেউটা সর্পের দংশনে শরীরে কন্‌কনে্ যন্ত্রণা হয় এবং আহত ব্যক্তি যন্ত্রণায় হাত পা ছুড়িতে থাকে। উহার মুখে ফেণা উঠে এবং বিষের ক্রিয়ায় সর্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। ইহারা জলাভূমিতে মানুষকে কামড়ায়। গোখুরার আঘাতে শরীরে অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। ইহারা কখনও জলে কামড়ায় না। ইহাদের বিষে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং গুরুতর আঘাতের সন্দে সন্দে মরিয়া যায়। আইরাজ ও কানড় প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।

বোড়া (পাইথন) সর্প আকারে খুব বড় হয়। উহার প্রকারভেদ আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রবোডাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা অন্য সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই সর্পকে ভয়াবহতার জন্য অজগর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা শিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। ইহারা একই পথ দিয়া যাতায়াত কবে। দড়ি দিয়া ফাঁসি প্রস্তুত করতঃ উহাদের গমন পথে পাতিযা রাখিলে আটকাইয়া যায়। এই সমস্ত সর্প লম্বায় প্রায় ২৫ ফুট এবং ওজনে পাঁচমণ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

শঙ্খচুর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর সর্প আর নাই। উহা দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। হিংসা ও ক্রোধ উহার সর্বদেহে জড়িত। ছোবল মারিবার সময় শুধুমাত্র লেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রায় মানুষের সমান উঁচু হইয়া থাকে। ফণা বিস্তার করিয়া এই সর্প যখন ফোঁস ফোঁস শব্দ কবিতে থাকে তখন ইহার সম্মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই।

হবিণবোড়া সর্প আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং হরিণ ও ছাগলের ন্যায় জন্তু আস্ত গিলিয়া খাইতে পাবে। বীভজড়ি সর্পের কালনাগিনী, রুদ্রকাল, মহাকাল প্রভৃতি প্রকার ভেদ আছে, শঙ্খরাজ সাপ খুব বড়, ফণাধাবী সর্পের ন্যায় ছোবল মারিবার জন্য যখন উঁচু হইয়া উঠে তখন ইহাদের গাত্রে কয়েকটি ভাঁজ পড়ে। উহা দেখিতে অতীব সুন্দর।

বাকাল সাপের তিনটি শিরা আছে। সেই জন্য উহা দেখিতে বিশেষ ধরণের। কালনাগিনীর কাল গাযে লাল ফুলের চিহ্ন থাকে। উদয়কাল সর্প বহুরূপী। উহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাব বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। যত বড় বিষধর সর্প হউক না কেন সাপুড়েরা উহাব বিষদাত ভাঙ্গিয়া বশে আনয়ন কবে। সুন্দরবন হইতে আদেশপত্র লইয়া লোকে বড় বড় সর্প ধরিয়া শহবে লইয়া আসে।

ব্যাঘ্রের ন্যায় সর্প মানব জাতির মহাশত্রু। কিন্তু শুনা যায়, উহারও যথেষ্ট গুণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিষাক্ত সর্পের অবস্থান দেশের আবহাওয়ার পক্ষে মঙ্গলকর। দেশে সর্পকূল না থাকিলে বনে জঙ্গলে চোর, ডাকাত লুক্কায়িত থাকিয়া মানুষের সর্বনাশ সাধন করিত। সর্পেব চামড়া মূল্যবান। উহা দ্বারা জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাপুড়িয়ারা বড় বড সর্প ধরিয়া আনিয়া গ্রামে খেলা করিয়া আয় উপার্জন করে এবং অবসব সময়ে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাপের খেলা দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে সর্প সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী অঞ্চলে অসংখ্য সর্প আছে। সেখানকার লোকেরা বলে যে জনৈক সাপুড়িয়া অসংখ্য সর্প লইয়া অন্যত্র যাইবাব সময় নদীতে নৌকাসহ ডুবিয়া যায়। সাপুড়িয়া অর্থের মায়ায় বৃহত্তম সর্পটির লেজ ধরিয়া থাকে এবং সমস্ত সর্প ঐ সর্পের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। পরে সাপুড়িয়া বড় সর্পটিকে ছাড়িয়া দিলে সমস্ত সর্প একযোগে মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরেব জঙ্গলে প্রবেশ করে। তখন হইতে ঐ অঞ্চলে সর্পের আধিক্য বাড়িয়া যায়। গল্পটি কতদূর সত্য জানিনা।